সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

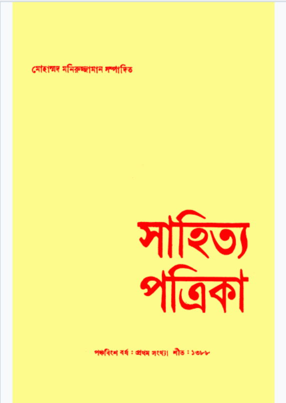

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

জয়দেব ও গীতগোবিন্দ

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সুশীলকুমার দে
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.13
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.13
Pages	213-224
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

জয়দেব ও গীতগোবিন্দ

সুশীলকুমার দে

জয়দেবের জীবনী সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই কিংবদন্তী-মূলক। সমস্ত কিংবদন্তীর যে ঐতিহাসিক মূল্য আছে তাহা মনে হয় না; কিন্তু এই গল্পগুলির একটি উপকারিতা আছে। ইহাদের আড়ালে জয়দেবের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তথ্যমাত্রদর্শী ঐতিহাসিকের গ্রহণযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁহাকে ও তাঁহার কাব্যকে কিরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এ সকল কাহিনী ছাড়িয়া দিলে, কবির কাব্যই তাঁহাকে জানিবার ও বুঝিবার আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার কাব্য হইতে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের কথা বেশি কিছু জানা যায় না। যে শেষ শ্লোকে কবি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা আবার সকল পুঁথিতে পাওয়া যায় না। রাণা কুম্ভের রসিকপ্রিয়া টীকাতে ইহার ব্যাখ্যা নাই; কিন্তু প্রাচীন কাশ্মীরী ও নেপালী পুঁথিতে এই শ্লোকটি রহিয়াছে। এই শ্লোক হইতে জানা যায়, কবির পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী (পাঠান্তরে রামাদেবী বা রাধাদেবী), এবং পরাশর প্রভৃতি প্রিয়বন্ধুর প্রীত্যর্থে গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল। প্রথম সর্গের 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' এবং দশম সর্গের 'জয়তি পদ্মাবতীরমণ-জয়দেবকবি-ভারতী-ভণিতমতি-শাতম্'—এই দুই পদ হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, জয়দেবের পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী। শঙ্কর তাঁহার টীকায় উভয়ত্র এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। প্রাচীন টীকাকার ধৃতিদাস লিখিয়াছেন—'পদ্মাবতী নাম জয়দেবস্য ভার্যা'। যদিও পূজারী গোস্বামীর টীকায় প্রথম-উদ্ধৃত পদের এরূপ ব্যাখ্যা করা হয় নাই, তথাপি দ্বিতীয় পদটির ব্যাখ্যায় তিনি 'তথানাম্নী জয়দেবপত্নী' এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু মুম্বই নির্ণয়সাগর যন্ত্রের সংস্করণে উপরোক্ত দ্বিতীয় পদটির ভিন্ন পাঠ ধরা হইয়াছে, তাহাতে পদ্মাবতীর নামোল্লেখমাত্র নাই; যথা—'জয়তি জয়দেব-কবি-ভারতী-ভূষিতম্' ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ যোগ্য, রাণা কুম্ভের রসিকপ্রিয়া টীকায় 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' পদটির উল্লিখিত ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে যে, পদ্মাবতী শব্দের দ্বারা এখানে কেবল পদ্মহস্তা দেবী লক্ষ্মীর নির্দেশ বুঝিতে হইবে। যাহা হউক, প্রাচীন টীকাকার-গণের মধ্যে এইরূপ মতভেদ থাকিলেও, যে ঐতিহ্য লইয়া পদ্মাবতী জয়দেব-পত্নীর নাম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহা এত সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত যে ইহা নিতান্ত অমূলক নয় বলিয়াই মনে হয়। কেন্দুবিল্ব যে কবির জন্মস্থান তাহা তৃতীয় সর্গের একটি পদ হইতে অনুমিত হয়। এই কেন্দুবিল্ব বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয় নদীর তীরবর্তী কেঁদুলি গ্রাম এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে; এবং এখনও এই গ্রামে জয়দেবের উদ্দেশে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে উৎসব হইয়া থাকে। যে পদটিতে কেন্দুবিল্বের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতে জয়দেবকে বলা হইয়াছে 'কেন্দুবিল্ব-সমুদ্রোদ্ভব-রোহিণীরমণ' অর্থাৎ 'কেন্দুবিল্বরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত চন্দ্র'। কিন্তু সাধারণভাবে চন্দ্র-অর্থে প্রযুক্ত রোহিণীরমণ এই শব্দের মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাকার দেখিয়াছেন—জয়দেবের রোহিণী নাম্নী সহজ-সাধিকার ইঙ্গিত।

গীতগোবিন্দে রাজা লক্ষ্মণ সেনের নামকীর্ত্তন নাই, কিন্তু জয়দেব তাঁহার সমসাময়িক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তৎকালীন কবিদের উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

উমাপতি-ধর ধরে বাক্যের প্রপঞ্চ পল্লবি';
দুরূহ পদের দ্রুত রচনায় শ্লাঘ্য শরণ কবি;
ধোয়ী কবিরাজ শ্রুতিধর; কে আচার্য্য গোবর্দ্ধনে
স্পর্দ্ধিতে পারে পরিমিত সাধু শৃঙ্গার-বর্ণনে।

একমাত্র স্বয়ং জয়দেব জানেন সন্দর্ভশুদ্ধ বাক্য-রচনা! এই সকল কবিদের ও জয়-দেবের রচনা হইতে লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক শ্রীধর দাস তাঁহার সদুক্তিকর্ণামৃত নামক সুভাষিতসংগ্রহে (খ্রীঃ অঃ ১২০৬) বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয়, জয়দেবেরও আবির্ভাব কাল হইতেছে লক্ষ্মণ সেনের সমকাল—খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের উত্ত-রার্দ্ধে। ইহা উল্লেখযোগ্য, গুজরাতের শার্ঙ্গদেব বাঘেলার সময়ে (সংবৎ ১৩৪৮=খ্রীঃ অঃ ১২৯২) উৎকীর্ণ শিলালিপিতে জয়দেবের দশাবতার-স্তুতি শ্লোক (বেদানুদ্ধরতে ১।১৬) মঙ্গলশ্লোকরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কয়েকটি তথ্য ভিন্ন জয়দেবের আর কোন নির্ভর-যোগ্য ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় না।

বাংলা দেশ বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ব্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। গুপ্ত সম্রাটদের আমল হইতে চতুর্ভুজ চক্রধারী বিষ্ণুর উপাসনার প্রমাণ আছে সত্য, কিন্তু কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণ উপাসনার নিদর্শন নাই। পাহাড়পুর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা হইতেও রাধাকৃষ্ণের উপাসনা কতদিন হইতে বা কত বিস্তৃতভাবে এ দেশে প্রচলিত ছিল তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ভোজদেবের বেলাবলিপিতে 'মহাভারত-সূত্রধার' ও 'গোপীশত-কেলিকার' কৃষ্ণের কথা আছে; কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বেলাবলিপি খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ 'অংশকৃতাবতার',—ভাগবতোক্ত বা চৈতন্যসম্প্রদায়-নির্দ্দিষ্ট স্বয়ং ভগবান্ নহেন। প্রায় এই সময়েই জয়দেবের গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলীলা স্পষ্টরূপে কাব্যের বিষয়ীভূত হইয়াছে, এবং কবি এখানে দশাবতারী শ্রীকৃষ্ণের ('দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায়') নমস্কার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত রাধাপ্রসঙ্গ-বর্জ্জিত কৃষ্ণগোপীলীলা জয়দেবের উপজীব্য নয়; বরং গোপীদের কথা থাকিলেও রাধাই এখানে মূলাধার।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শৃঙ্গাররসবহুল রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসই জয়দেবের কবিকল্পনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। গীত-গোবিন্দের

আকাশ মেদুর মেঘে, তমালের দ্রুমে শ্যাম বনভূমি,
রাত্রি এখন, ভীরু এরে রাধে, গৃহে লয়ে যাও তুমি,—
নন্দের এই আদেশে চলিত আঁধারকুঞ্জনীড়ে
রাধামাধবের নির্জ্জন কেলি জয়তু যমুনাতীরে।

এই প্রথম শ্লোকে বর্ণিত প্রসঙ্গটির নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু ইহার উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রাচীনতর পুরাণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বরং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। জয়দেবের কাব্যে বসন্তকালীন রাসের বর্ণনা রহিয়াছে; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের রাস শরৎ-কালীন। গোপীলীলার কথা আছে, কিন্তু শ্রীরাধার স্পষ্ট উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মত, জয়দেবের কাব্যে শ্রীরাধাকে রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের

সকল বিলাসলীলার কেন্দ্ররূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহা আরও উল্লেখযোগ্য, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণকার কৃষ্ণরাধার নিয়মিত বিবাহের অনুষ্ঠান করিয়া পরকীয়াবাদের সমর্থন করেন নাই; গীতগোবিন্দ আলোচনা করিলেও "পরকীয়াভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলব্ধি হয় না"—এ কথা গীতগোবিন্দের সুযোগ্য সম্পাদক বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও স্বীকার করিয়াছেন। ভগবদুপাসনার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই দুইটি দিকই গীতগোবিন্দে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সমানভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই সকল নিদর্শন হইতে মনে হয়, জয়দেবের সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতানুমোদিত বৈষ্ণব ভক্তির ধারা বাংলা দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; খুব সম্ভব, ব্রহ্মবৈবর্ত্তকারের মত, জয়দেব অন্য একটি বিভিন্ন ধারার অনুগামী। কিন্তু রামানুজী বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতবাদের কোন পরিচয় জয়দেবের কাব্যে পাওয়া যায় না; বরং গীতগোবিন্দে যে বৈষ্ণবভাবের উপালব্ধি হয় তাহা কোন সম্প্রদায়-সংশ্লিষ্ট নয় বলিয়াই মনে হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়-চতুষ্টয় শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, জয়দেব তাহা স্পষ্টতঃ করেন নাই। এমন কি, ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, তিনি মধুররস-সমুজ্জ্বল কৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় ব্রহ্মবৈবর্ত্তকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐক্য থাকিলেও পার্থক্য রহিয়াছে। গীতগোবিন্দে শ্রীরাধাকে উজ্জ্বলরসের নায়িকারূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে। কবি শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন, এবং গ্রন্থের ও প্রতিসর্গের নামকরণে গোবিন্দের নামই কীর্ত্তিত হইয়াছে, রাধার নয়; প্রথম দুইটি বন্দনাস্তোত্রে রাধার নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েরই সমান প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং এই পুরাণে ও গীতগোবিন্দে বৃন্দাবনবিলাসের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও, এমন কোন প্রমাণ নাই যে জয়দেব ইহা হইতে সাক্ষাৎভাবে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ বৈসাদৃশ্যেরও অভাব নাই। এমন হইতে পারে, উভয় গ্রন্থই এক অধুনালুপ্ত মূল অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া কোন কোন বিষয়ে আপাতসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

অন্যান্য প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্কের অনুগামী বৈষ্ণবগণও রাগমূলক উপাসনা-পদ্ধতি স্বীকার করেন; এবং ইহাদের উপাসনা-তত্ত্বে রাধারও স্থান রহিয়াছে। নিম্বার্কের আবির্ভাব-কাল ঠিক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু তিনি জয়দেবের প্রায় সমসাময়িক এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে জয়দেবের পূর্ব্বে বাংলাদেশে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রভাবও স্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক, বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণের রসোপাসনা কি প্রভাবে বা কাহার দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা দুরূহ, কারণ তদানীন্তন বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসের সুস্পষ্ট পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। যতটুকু জানা যায়, তাহা হইতে এরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, জয়দেব, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণকার ও নিম্বার্ক এই তিনজনই আপন-আপন অনুভবের দ্বারা কোন অধুনালুপ্ত বৈষ্ণব-ভাবের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। এই ধারা বোধ হয় পরবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবর্ত্তিত ধারা হইতে স্বতন্ত্র; এবং ইঁহাদিগকে পরস্পরের নিকট ঋণী বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনও প্রমাণ নাই। ইহা আরও সম্ভব, জয়দেবের কবিকল্পনার উপর কোন প্রকার সহজিয়া মতবাদেরও প্রভাব ছিল, কারণ বৈষ্ণব সহজিয়াগণ জয়দেবকে আপনাদের আদিগুরু ও নব রসিকের একজন রসিক বলিয়া গণনা করেন। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যেও এইরূপ সহজভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু চৈতন্য-পূর্ব্ব সহজিয়া মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এত অল্প যে এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

তবে ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়, বাংলা দেশে চৈতন্য সম্প্রদায়ই শ্রীমদ্ভাগবতানু-মোদিত ভক্তিবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ইহাদের প্রামাণিক গ্রন্থ নহে,

এবং নিম্বার্ক বা সহজিয়া মতবাদের প্রভাবও ইহাদের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, জয়দেবের কাব্যগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতকে অনুসরণ না করিয়াও কিরূপে চৈতন্য-সম্প্রদায় কর্তৃক তাহাদের অন্যতম ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে, জয়দেব মুখ্যতঃ কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার কাব্যগ্রন্থে এরূপ একটি ভাব আছে যাহা সম্প্রদায়বিশেষেরও গ্রহণ-যোগ্য হইয়াছিল। জয়দেব হয়ত ভক্ত ছিলেন; কিন্তু কেবল ভক্তি নয়, কবিকল্পনা তাঁহার প্রেরণার মূলে ছিল বলিয়া কাব্যগ্রন্থ রচনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই কাব্য নির্বিশেষ রসপদবীতে আরোহণ করিয়া সকল বিশিষ্ট মতবাদের ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে; এবং এই অসাম্প্রদায়িক নির্বিশেষ ভাব ছিল বলিয়াই ইহাকে অঙ্গীকার করিতে কোনও বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের অসুবিধা হয় নাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কেবল চৈতন্য-সম্প্রদায় কর্তৃক নয়, বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় কর্তৃকও গীতগোবিন্দ গৃহীত হইয়াছে; এবং তৎসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র বিঠ্‌ঠলেশ্বর গীতগোবিন্দের সাক্ষাৎ অনুকরণে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক 'শৃঙ্গাররসমণ্ডন' (মুম্বই, সংবৎ ১৯৭৫) নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং, চৈতন্য-সম্প্রদায় যে গীতগোবিন্দকে "শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য" বলিয়া গ্রহণ করিবেন তাহা বিচিত্র নয়। গীতগোবিন্দের এরূপ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ইতিহাসসম্মত না হইলেও সহজসাধ্য। জয়দেবের ভাবমূলক পদাবলীগুলিকে, ভক্তিশাস্ত্রবর্ণিত উজ্জ্বল রসের উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে ভক্তিরসশাস্ত্রের কবি করিয়া তোলা কিছুই কঠিন ছিল না। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, জয়দেবের অন্ততঃ তিন শত বৎসর পরে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তৎসম্প্রদায়-প্রবর্তিত রসশাস্ত্র বৃন্দাবনগোস্বামীগণ কর্তৃক আরও পরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং গোস্বামীমতের প্রচার জয়দেবের এত পরবর্ত্তী সময়ে হইয়াছিল যে তাঁহাকে গোস্বামীমতের বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কবি হিসাবে বৃন্দাবন-লীলার মাধুর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ ও বিভোর করিয়া-ছিল; কিন্তু তিনি রূপ গোস্বামীর মত রসশাস্ত্রের উদাহরণস্বরূপ অথবা সেই শাস্ত্রের আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে শুধু ইতিহাসের অপলাপ নয়, তাঁহার কবি-প্রতিভারও অসম্মান করা হয়। ইহা সত্য, জয়দেব হরিগুণগানের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়া-ছেন, কিন্তু তিনি বিলাস-কলা-কুতূহলের কথাও বলিয়াছেন। জয়দেব যে রসিক ভক্ত ছিলেন তাহা তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট; কিন্তু তিনি তত্ত্বান্বেষী ছিলেন না। তাঁহার কল্পনা-প্রবৃত্তির স্বরূপ ছিল মুখ্যতঃ কবিধর্ম্মী।

সুতরাং গীতগোবিন্দের কবি মধুর রস বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আশ্রয় করিয়া লিখিয়া-ছেন বলিয়াই যে সাম্প্রদায়িক রসশাস্ত্রের নিয়মে তাঁহার কাব্যের মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইবে তাহা ঠিক নহে। অনেকে জয়দেবের বহুপরবর্ত্তী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিবৃত তত্ত্ববাদ অবলম্বন করিয়া জয়দেবের বৈষ্ণব ভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু গীতগোবিন্দ চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্যতম সূত্রগ্রন্থরূপে পূজিত হইলেও এরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা সাধারণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঐতিহাসিক ধারা বা পারম্পর্য্য উপেক্ষিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এরূপ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার দ্বারা জয়দেবের রচনার প্রকৃত তাৎপর্য্যও যথাযথ গৃহীত হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, জয়দেব ছিলেন কাব্যামোদী রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ও গীতিবিশারদ কবি; সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সৃষ্টির দ্বারা মনোরঞ্জন করাই তাঁহার কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। আদিরস চিরদিনই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আধার; এবং ভক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের দেশে আদিরসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। সুতরাং বৃন্দাবনলীলার চিরন্তন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য অবলম্বন করিয়া, জয়দেবের মত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কবি কাব্যসৃষ্টি করিবেন ইহা স্বাভাবিক। চৈতন্যানুগামী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তিশাস্ত্রেও রাধাকৃষ্ণের প্রেম মধুর রসের আকররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাদৃশ্য এইটুকু; কিন্তু জয়দেব পরবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্র অনুসরণ করেন নাই, পরবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্রই তাঁহার

কাব্যগ্রন্থকে শাস্ত্রগ্রন্থরূপে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। চৈতন্য-সম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তিকে রসরূপে আস্বাদন করে, এবং শৃঙ্গারমূলক উপাসনাই তাঁহাদের উপাসনা-তত্ত্বে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বহুপূর্ব্ববর্ত্তী জয়দেবের কাব্যগ্রন্থেও এই ভক্তিমূলক শৃঙ্গাররসই অঙ্গী। এইজন্য বোধ হয় জয়দেবের উজ্জ্বল-রসাভিষিক্ত পদাবলী চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রীতিকর ছিল বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তী সময়ে গীতগোবিন্দকে ধর্মগ্রন্থ ও জয়দেবকে সম্প্রদায়ানুযায়ী ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ পরম বৈষ্ণবরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এইরূপ আরও দেখা যায়, চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মার্ত্ত পঞ্চো-পাসক বিদ্যাপতিকে এবং বাশুলীদেবীর উপাসক চণ্ডীদাসকে শাস্ত্রসম্মত বৈষ্ণব কবি সাজাইয়া, ইদানীন্তন বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহাদের গানগুলিকে যে-রসে যেটি উপযোগী সেইরূপ বসাইয়া স্বকীয় রসশাস্ত্রের আদর্শে গ্রহণ করিয়াছে। এই মনোভাবের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় রূপগোস্বামীর পদাবলী নামক বৈষ্ণব-কবিতা-সংগ্রহে। ইহার মধ্যে অবৈষ্ণব অমরু ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের শৃঙ্গাররসাত্মক রচনাও বৈষ্ণব ভাবের পরিবেষ্টনীর মধ্যে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে!

কবিসুলভ গর্ব্বে জয়দেব আপনাকে 'কবিরাজরাজ' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন; এবং তাঁহার এই কবি-অভিমান একেবারেই নিরর্থক নয়। সুতরাং তাঁহার রচনার এই দিকটা কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনায় দ্বাদশ সর্গে জয়দেবের অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। সর্গবন্ধ কাব্যের আকারে লিখিত হইলেও ইহা ঠিক সংস্কৃত কাব্যের আদর্শে গঠিত নয়, এ কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। আখ্যানভাগ বা বর্ণনার জন্য মধ্যে মধ্যে মামুলী সংস্কৃত ছন্দে রচিত শ্লোকাবলী দ্বারা ইহার অসংবদ্ধ পদাবলীগুলি একত্র গ্রথিত করা হইয়াছে; কিন্তু এই পদগুলিই ইহার সর্ব্বস্ব। জয়দেবের নিজের ভাষায়, কাব্যখানি 'মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী'র সমষ্টিমাত্র। সমস্ত কাব্যটিতে কৃষ্ণ, রাধা ও সখীর উক্তিগুলি সুর-তালে গেয় এই পদাবলীর আকারেই সজ্জিত। সুতরাং ইহাকে সত্যকার গীতিকাব্য বলা যাইতে পারে; কিন্তু গীতিকবিতার মধ্যে আখ্যান, বর্ণনা ও সংলাপ ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত রহিয়াছে। সর্গ-বর্ণিত বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যেক সর্গের পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রথম সর্গের নাম 'সামোদ-দামোদর'। রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া সরস বসন্তের প্রারম্ভে কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীগণের সহিত কেলি-বিলাসে মগ্ন। কৃষ্ণের পূর্ব্বপ্রীতি স্মরণ করিয়া রাধা ভাবিতেছেন, আমার প্রিয় দামোদর আজ আমাকে বিস্মৃত হইয়া অন্যত্র সুখসম্ভোগে মাতিয়াছেন; রাধার এই স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া সর্গটির নাম সামোদ-দামোদর। দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অক্লেশ-কেশব'। রাধা সখীর নিকট পুনর্ব্বার মিলনের উৎকণ্ঠায় মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু কেশব ক্লেশরহিত। তৃতীয় সর্গের নাম 'মুগ্ধ-মধুসূদন'। গোপীদের পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ মুগ্ধ ও অনুতপ্ত চিত্তে রাধার অন্বেষণ করিতেছেন। চতুর্থ সর্গ 'স্নিগ্ধ-মধুসূদন'। রাধার সখী কৃষ্ণের নিকট আসিয়া ভাবনালীনা বিরহদীনা রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। পঞ্চম সর্গ 'সাকাঙ্ক্ষ-পুণ্ডরীকাক্ষ'। সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া রাধা আবার অভিসারে আসিবেন এই আকাঙ্ক্ষায় ধীরসমীরে যমুনাতীরে পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতীক্ষা করিতেছেন। ষষ্ঠ সর্গ 'ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ'। রাধার বাসকসজ্জা বর্ণনা করিয়া সখী যেন বলিতেছেন, হে ধৃষ্ট তুমি কি এখনও কুণ্ঠাশূন্য থাকিবে? সপ্তম সর্গ 'নাগর-নারায়ণ'। বহুবল্লভ নাগরের ছলনায় বিরহখিন্না রাধা এখন বঞ্চিতা ও বিপ্র-লব্ধা। অষ্টম সর্গ 'বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি'। খণ্ডিতা নায়িকারূপিণী রাধার দুর্জ্জয় মান দেখিয়া লক্ষ্মীপতি তাঁহার পদসেবিকা লক্ষ্মীর তুলনায় রাধার প্রেমের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। নবম সর্গ 'মুগ্ধ মুকুন্দ'। কলহান্তরিতা রাধার মানভঞ্জনের চিন্তায় মুকুন্দ মুগ্ধ হইয়াছেন। দশম সর্গ 'চতুর-চতুর্ভুজ'। মানিনীর পদযুগল ধারণ করিয়া কৃষ্ণ এখানে

স্তুতি ও চেষ্টায় চতুর। একাদশ সর্গ 'সানন্দ-গোবিন্দ'। মানভঞ্জনের পর মিলন-সম্ভাবনায় গোবিন্দ আনন্দিত হইয়াছেন। দ্বাদশ সর্গ 'সুপ্রীত-পীতাম্বর'। রাধাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়া পীতাম্বর এখন সুপ্রীত ও কৃতার্থ।

শুধু ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক হইতে দেখিলে জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশেষ নূতনত্ব আছে বলিয়া মনে হইবে না। পূর্ব্বরাগ হইতে মিলন পর্য্যন্ত প্রেমের যাহা কিছু ভাব ও লীলা, তাহার সরস চিত্র পূর্ব্বগামী সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। জয়দেব তাঁহার কাব্যে এমন কোনও বিচিত্র ভাব বা অবস্থার বর্ণনা করেন নাই, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের দ্বারা বর্ণিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনও সংস্কৃত কাব্যে নূতন নহে। কিন্তু মূল বিষয়টি অথবা ইহার আনুষঙ্গিক ভাবরাজি পুরাতন ঐতিহ্য বা প্রাচীন কবিগণের নিকট হইতে নিপুণভাবে আহৃত হইলেও জয়দেবের কাব্যের রসরূপটি তাহার নিজস্ব। কেবলমাত্র ভাব বা প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাহার উৎকর্ষ নয়; এ সকল চিরাগত ভাব বা সর্ব্বসাধারণ বিষয় যে স্বতন্ত্র আকার ও ভঙ্গিমা ধারণ করিয়াছে তাহাতেই তাহার বৈশিষ্ট্য। ইহা সত্য যে, জয়দেবের কাব্যের বহিরঙ্গ রূপটি সর্ব্বাগ্রে প্রতিভাত হয়। ইহার শব্দ, অর্থ, ভঙ্গি, ছন্দ,—এক কথায় ইহার গঠন শিল্পের চমৎকারিতা মনকে সহসা চকিত ও আনন্দিত করিয়া তোলে, ভাবগ্রহণের অপেক্ষাও রাখে না। কিন্তু ইহার অন্তর্গত ভাব ও বহিরঙ্গ রূপ, এই উভয়েরই সমগ্রতা লইয়া কবির কাব্য-প্রতিভার বিকাশ। ইহাকেই আমরা তাহার কাব্যের রসরূপ বলিতেছি।

কিন্তু কেবল শিল্পী হিসাবে জয়দেবের কৃতিত্ব এত অসাধারণ যে অনেক সময় তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যকে তাঁহার কবি-প্রতিভার সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরা কিছু অস্বাভাবিক নয়। ইংরেজ কবি কীট্‌স বলিয়াছেন—Poetry must surprise by its fine excess. গীতগোবিন্দে এ কথা খুব খাটে। কবিকল্পনার প্রাচুর্য্য ত আছেই, কিন্তু fine এই শব্দটির দ্বারা শিল্পীর যে সংযম ও নৈপুণ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও গীতগোবিন্দের লিপিকুশলতায় বর্ত্তমান। বাগর্থের পরস্পরসাপেক্ষ সার্থকতা, শব্দময় আলেখ্য-লিখনে দক্ষতা, ধ্বনি-বৈচিত্র্য, ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য, পদ-লালিত্য ও গীতি-মাধুর্য্য এই কাব্যটিকে অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু কাব্যকলার অপরিমিত স্ফূর্ত্তি ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও, সামর্থ্যের স্বেচ্ছাচার বা প্রাগল্‌ভ্য নাই; শিল্প-নৈপুণ্যের সূক্ষ্মতা থাকিলেও, অনর্থক আড়ম্বর বা কৃত্রিমতা নাই; ইহার কান্ত কোমলতা ও স্বচ্ছন্দ গতি মনকে তন্ময় করিয়া দেয়। নিছক শব্দ-সম্পদে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী; প্রাচীন কবিগণ যে অদ্ভুত শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা কেবল সংস্কৃতের মত ভাষার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দমাত্র-পরম্পরায় যে অন্তর্লীন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, তাহার অসামান্য প্রয়োগে সমৃদ্ধ এতাদৃশ সংস্কৃত সাহিত্যেও জয়দেবের মত শিল্পী কবি দুর্লভ। সেইজন্য তাঁহার কবিতা ভাষান্তরিত করা দুঃসাধ্য, কারণ তাঁহার সুনির্ব্বাচিত শব্দগুলির প্রতিশব্দ দেওয়া যায় না। জয়দেব শব্দমন্ত্রে যেমন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, গীতিচ্ছন্দেও তেমনি তাঁহার অপূর্ব্ব অধিকার। তথাপি কেবল নিপুণ শিল্পী বলিয়া অভিহিত করিলেই জয়দেবের কবি-প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ বহিরঙ্গ করিগরিই তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সর্ব্বস্ব নয়। এই স্বভাবসিদ্ধ শিল্প-নৈপুণ্য তাঁহার ভাব ও কল্পনার অঙ্গমাত্র। তাঁহার শব্দ ও ছন্দ বিষয়বস্তুর অনুগামী; বাহির হইতে আরোপিত নয়, কেন্দ্রগত অনুভূতি হইতে আপনি বিকশিত। যে ধ্যান ও গীতি তাঁর আত্মগত অনুভব ও প্রীতির রঙে সুন্দর ও মধুর হইয়া তাঁহার কবি-হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে তাহাকে তিনি সম্পৃক্ত বাগর্থ-পরম্পরায় তাহার অনুরূপ সুন্দর ও মধুর রূপ দিয়াছেন।

কারণ, জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দে কেবল ইষ্টদেবতার অপ্রাকৃত লীলাবর্ণনা অথবা প্রাচীন কবিদের মত প্রাকৃত প্রেমগাথা রচনা করেন নাই; এই প্রেম ও লীলা যে-রূপে

তাঁহার কল্পনা-দর্পণে ও অনুভূতির আলোকে প্রতিফলিত হইয়াছিল সেই অপরূপ রূপটি তাঁহার চিত্রে ও গানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার রচনায় অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃত, ভক্তির সহিত প্রীতি, কল্পনার সহিত বাস্তব-অনুভূতি একাকারে মিশিয়া গিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের যে চিরন্তন প্রেমলীলা তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা শুধু কাহিনী-মাত্র নয়, তাঁহার ও তাঁহার শ্রোতৃবর্গের নিকট তাহা বাস্তব-জগতের বিচিত্র রূপে ও রসে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সেই জন্য কবি শুধু ধ্যানধারণার নিত্য-বৃন্দাবন সৃষ্টি করেন নাই; তাহাকে কবি-মানসের সুখ, দুঃখ, আকাঙক্ষা ও অনুভূতির রসে অভিষিক্ত করিয়া অপূর্ব্ব বাস্তব-সুষমায় প্রতিফলিত করিয়াছেন। প্রাকৃত প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবি-রূপে অপ্রাকৃতিক বৃন্দাবনলীলা, মানবোচিত ভাব ও ভাষায়, উজ্জ্বল ও গীতিময় শব্দচিত্র-পরম্পরায় সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হইয়াছে। এই বাস্তব ও কল্পনার সংযোগ, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গত ভাবের মিশ্রণ,—ইহাই গীতগোবিন্দের অন্তর্গত কাব্যবস্তু। আদিরসের মত মানব-হৃদয়ের একটি নিগূঢ়, মধুর ও শক্তিশালী বৃত্তিকে ধর্ম্ম-সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া, অপরূপ দেবলীলাকে সুপরিচিত মানবলীলার যে নির্দ্দিষ্ট রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য-পিপাসু ভক্তের আদরের সামগ্রী নয়, কাব্যরস-পিপাসু সহৃদয়মাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী। এখানে মর্ত্ত্য প্রেমের মধ্য দিয়াই অমর্ত্ত্য প্রেমের সাক্ষাৎকার হইয়াছে; আপনার কামনার মধ্যেই আপনার সাধনাকে কবি সার্থক করিয়াছেন। সেইজন্য শুধু ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে নয়, কাব্যগ্রন্থ হিসাবেও গীতগোবিন্দের উৎকর্ষ।

তাই কবির রাধা শুধু কল্পলোকের কল্পনারূপিণী নহেন, তাঁহার জীবনের সমস্ত অনুভূতি ও প্রীতির বাস্তব-লক্ষ্মী। এখানে মানবী হইতে দেবীকে পৃথক করা যায় না। পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আদর্শকে কবি যেন কোন বিশিষ্ট বিগ্রহের মধ্যে অনুভব করিয়া, কল্পনা-লোকের অপরিমেয়তাকে জীবনের পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে, অপার্থিবকে পার্থিব রূপরসের সীমার মধ্যে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। কারণ, সকল প্রকৃত কবির মত তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্র ও ভঙ্গুর অনুভূতির উপরই অতীন্দ্রিয় জগতের বৃহত্তর ও শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য তাঁহার কাব্যের রসরূপটি সম্পূর্ণ কল্পনামূলক নয়। যিনি বাহির-ভুবনে ও কায়া-সৌন্দর্য্যে তাঁহার বাহুপাশে ধরা দিয়াছেন, তিনিই আবার গানের আড়ালে ও ছায়া-সৌন্দর্য্যে কল্পনারূপিণী হইয়া সাড়া দিয়াছেন। ভাব ও বস্তুর, স্বপ্ন ও সত্যের, অন্তর ও বাহিরের এই স্পষ্ট ও অপূর্ব্ব সংমিশ্রণই গীতগোবিন্দের অন্তর্গত প্রেরণার ও বহিরঙ্গ প্রকাশের মূলে রহিয়াছে। যদি গীতি-প্রাণতা ও আত্মগত ভাবনার দ্বারা বহির্গত জগৎকে আত্মসাৎ করা গীতি-কবিতার, অথবা ইংরেজি পরিভাষায় Lyric কবিতার, মূল-লক্ষণ হয়, তবে জয়দেবের পদাবলী প্রকৃত গীতি-কবিতার বা Lyric-এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এবং ইংরেজিতে যাহাকে pictorial art বা চিত্রাঙ্কণ শক্তি বলে, তাহা তাঁহার শব্দময় আলেখ্য-লিখনে অসামান্য পরিণতি লাভ করিয়াছে।

এই হিসাবে বলা যাইতে পারে, জয়দেবের কাব্যে সংস্কৃত গীতি-কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তথাপি ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জয়দেবের রচনাকে প্রাচীন সংস্কৃত গীতি-কবিতার কোন বিশিষ্ট পর্য্যায়ে নিশ্চিতরূপে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। পূর্ব্বতন সংস্কৃতের ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিলেও তিনি তাহাদিগকে নূতন আকারে ও প্রকারে প্রয়োগ করিয়াছেন। সমস্ত কাব্যটি বাহির ও ভিতর হইতে যে নূতন ও বিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত কাব্যের সম্পূর্ণ অনুযায়ী নয়; বরং সমসাময়িক নবোদিত দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধিকতর অনুরূপ। বাহ্যতঃ নাটকের কিঞ্চিৎ আবরণ থাকিলেও, জয়দেবের রচনা গীতিপ্রাণ ও গীতিসর্ব্বস্ব; ইহার গীতগোবিন্দ নামটিই তাহার নিদর্শক। কিন্তু মেঘদূতকে যদি গীতি-কবিতা বলা যায়, তবে এই প্রাচীনতর নিদর্শনের সহিত গীতগোবিন্দের সাদৃশ্য অতি অল্প। আবার সর্গ-বিভাগ হইতে ইহাকে

ঠিক সংস্কৃত আলংকারিকের কাব্য বলিয়া ধরা যায় না। কারণ সর্গবন্ধ কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি ইহাতে নাই বলিলেও চলে। অন্যদিকে আবার গীতগোবিন্দকে ঠিক দেশীয় গীতিনাট্য-শ্রেণীর রচনাও বলা যায় না। ভাবপ্রবণতায় ও গীতিবাহুল্যে দেশীয় গীতাভিনয়ের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও, প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রাদির সহিত ইহার পার্থক্যও রহিয়াছে। ইহার নাট্যবস্তু যৎসামান্য, এবং যাত্রাদির মত ইহা সাময়িক প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। উৎসবাদিতে জনসাধারণের জন্য প্রযুক্ত হইলেও, ইহা নিপুণ শিল্পীর সুঘটিত সৃষ্টি; রাগবহুল, প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ হইলেও কাব্যকলার সাবধানতায় সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ। প্রাকৃতানুযায়ী মাত্রাছন্দে ও দেশীয় ভঙ্গিতে রচিত গেয় পদগুলি ইহার সর্ব্বস্ব, কিন্তু তাহার সহিত সংস্কৃত ছন্দে রচিত আখ্যান ও বর্ণনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহার উপর—কাব্যস্মৃতিসমুজ্জ্বল যমুনার তটপ্রান্তে, কখনো মেঘমেদুর বর্ষার নবসমারোহে, কখনো সরস বসন্তের সুরভি সুষমায়, বৃন্দাবনের না হউক বাংলাদেশের তমালশ্যামল বনভূমি যে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ছায়াও জয়দেবের কোমল কান্ত পদাবলীর মাধুর্য্যসিক্ত ভাবরাজির সহিত বিচিত্ররূপে মিশিয়া গিয়াছে! তৎকালীন সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের যাহা কিছু মধুর ও সুন্দর উপাদান, তাহা গীতগোবিন্দে স্থান লাভ করিয়াছে; কিন্তু এই রচনার মধ্যে জয়দেবের কবি-প্রতিভার যে সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও শক্তিময় স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, তাহা ইহাকে সংস্কৃত বা দেশীয় কাব্য-সাহিত্যের গতানুগতিক ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

বাস্তবিক, রূপ ও রস এই দুই দিক হইতে আলোচনা করিলে মনে হয়, তৎকালীন কাব্যসাহিত্যে গীতগোবিন্দ একটি নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছিল। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ দেশীয় বলা যায় না, আবার সম্পূর্ণ সংস্কৃতও নয়। তথাপি কোন কোন সমালোচক মনে করেন, সংস্কৃতের ছাপ থাকিলেও এই কাব্য প্রথমতঃ দেশীয় ভাষায় ও দেশীয় প্রথায় রচিত, পরে সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ছন্দে লিখিত বর্ণনামূলক শ্লোকগুলি ছাড়িয়া দিলে, বাকি যে রাগমূলক পদাবলী গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেগুলি নামমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে রচিত; সেই ভাষা ও ছন্দের ভঙ্গি যতটা দেশী ভাষা ও ছন্দের অনুযায়ী ততটা সংস্কৃতের নয়। 'পদ' শব্দটি প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত হইলেও 'পদাবলী' শব্দটি যে অর্থে এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাও সংস্কৃত নয়। গীতগোবিন্দের সংস্কৃতের অলঙ্কার ও শব্দার্থগৌরব সর্ব্বত্র রক্ষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পদাবলীতে ব্যবহৃত ভাষার রচনাপদ্ধতি সংস্কৃত কাব্যের অনুরূপ নয়; বরং এই স্বচ্ছ ও সহজ গেয় পদগুলি দেশীয় গানেরই প্রকৃতি অনুসরণ করিয়াছে। এমন কি, অতি অল্প চেষ্টায় অনেক পদ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে পরিণত করা যায়। যেমন—

স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্

এই সংস্কৃত পদটি

সুমরই মন মম কিঅপরিহাসম্

এইরূপ প্রাকৃতে পরিণত করা কঠিন নয়। প্রাকৃতপিঙ্গলে উদাহৃত পাদাকুলক প্রভৃতি যে সকল মাত্রাছন্দ গীতগোবিন্দে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাও প্রাকৃত বা অপভ্রংশ কবিতার আত্মীয়, সংস্কৃতের নয়। সংস্কৃত ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস আছে কিন্তু পাদান্ত মিল বা rhyme নাই; গীতগোবিন্দের সমস্ত পদাবলী, অপভ্রংশ কবিতার মত, মিলযুক্ত। পদাবলী-রচনার ধরনও ভিন্ন। সংস্কৃত কবিতা সাধারণতঃ পাদচতুষ্টয়-সমন্বিত এক একটি শ্লোক বা stanza তে পর্য্যবসিত; এবং এইরূপ শ্লোকের সমষ্টি লইয়াই কাব্য। শ্লোকগুলি কখনো পরস্পর সংবদ্ধ, কখনো অসংবদ্ধ; কিন্তু এক একটি শ্লোক প্রায়ই এক একটি সম্পূর্ণ ভাবের দ্যোতক। পদাবলীর প্রকৃতি এরূপ নয়; এগুলি ব্যষ্টিভাবে লইলে সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য গ্রহণ

করা যায় না। গানের মত, পৃথকরূপে বিভিন্ন ভাবের জ্ঞাপক হইলেও এগুলিকে সমষ্টি-ভাবেই ধরিতে হইবে; এবং অন্তে নিবিষ্ট refrain বা ধ্রুবপদই ইহাদের ভাবপরম্পরার যোগসূত্র।

শুধু তাহাই নয়, পদাবলীর ছন্দগুলি পরবর্ত্তী বাংলা ছন্দের মূলস্বরূপ বলিয়া মাত্রাচ্ছন্দ হইলেও এগুলির ধ্বনিবৈচিত্র্য যে অতি সহজেই আধুনিক অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত বাংলা ছন্দে রক্ষা করা যায়, তাহা শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় তাঁহার গীতগোবিন্দের অনুবাদের অনেক স্থলেই দেখাইয়াছেন। যথা—

পশ্যতি। দিশি দিশি। রহসি ভ। বন্তং
ত্বদধর। মধুর ম। ধূনি পি। বন্তং।

বাংলায় ইহার অনুকরণে—

তোমারেই। দিশি দিশি। হেরিছে সে। কৃষ্ণ
অধরের। মধুপানে। সতত স-। তৃষ্ণ।

এইরূপ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জয়দেবের প্রযুক্ত ষোড়শমাত্রাযুক্ত পাদাকুলক ছন্দকে, যেমন—

দলিত কু। সুম দর। বিলুলিত। কেশা

অথবা

বিহরতি। হরিরিহ। সরস ব। সন্তে

এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়া ইহা হইতে চতুর্দ্দশ-অক্ষরযুক্ত যেমন—

কাশীরাম। দাস কহে। শুনে পুণ্য। বান্

বাংলা পয়ারের উদ্ভব দেখাইয়াছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথও

বদসি যদি। কিঞ্চিদপি। দন্তরুচি-। কৌমুদী

জয়দেবের এই ছন্দধ্বনির অনুকরণে—

একদা যবে। অঙ্গ ধরি। ফিরিতে নব। ভুবনে

এইরূপ অপূর্ব্ব বাংলা ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। এই পদাবলী ছাড়া গীতগোবিন্দে যে সকল মামুলী সংস্কৃত ছন্দের শ্লোক দেখা যায়, সেগুলির সন্নিবেশও দেশীয় গীতি-সাহিত্যের ধারার মধ্যে পাওয়া যায়; যেমন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা বক্তব্য বিষয়ের বিবৃতি ও পারম্পর্য্য রক্ষার পদ্ধতি রহিয়াছে।

এই সকল কারণে পিশেল্ (Pischel) প্রমুখ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, গীত-গোবিন্দ প্রথমে জনসাধারণের জন্য কোন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হইয়াছিল; পরে সংস্কৃতাভিমানী শ্রোতার জন্য সংস্কৃতে অনূদিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আধুনিক সময়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অনুমানের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই মতবাদের কোন সন্তোষজনক ভিত্তি নাই। জয়দেবের কাব্যের এরূপ উৎপত্তি বা পরিণতির কোন প্রবাদ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইহা সত্য যে গীতগোবিন্দের বর্ণনাত্মক বা বিবৃতিমূলক সংস্কৃত শ্লোকগুলি সমসাময়িক শ্রীধরদাস সঙ্কলিত সদুক্তি কর্ণামৃতে ও কাশ্মীরিক বল্লভদেব সংগৃহীত সুভাষিতাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার গেয় পদাবলী হইতে একটিও উদাহরণ দেওয়া হয় নাই! কেবলমাত্র ইহা হইতে এ সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণিত হয় না; অন্ততঃ পদাবলীগুলি যে প্রাকৃতে রচিত ছিল এরূপ অনুমাণের কারণ নাই। এমন হইতে পারে, পদাবলী উদ্ধৃত হয় নাই তাহার কারণ এগুলিতে সংস্কৃত শ্লোকের চেয়ে পদাধিক্য রহিয়াছে; এবং এগুলি দেশীয় ভাব, ভাষা ও ভঙ্গির প্রভাবে রচিত ধ্রুবপদসমন্বিত গান বলিয়া নিছক সংস্কৃত সুভাষিত-সংগ্রহে স্থান পায় নাই।

জয়দেবের কাব্যের আদিম রূপ নির্ণয় করিতে হইলে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, গীতগোবিন্দ যে-সময় রচিত হইয়াছিল সে-সময় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় শেষ অবস্থা বা অবনতির যুগ, এবং অপভ্রংশ বা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুদয়ের কাল। সেই জন্য এই পরিবর্ত্তন-যুগে এক শ্রেণীর রচনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যের নিয়ম-নিগড় দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নয়, অথচ নূতন দেশীয় সাহিত্যের পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ করে নাই। ইহার কারণ, যেমন দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উপর সংস্কৃতের প্রভাব পড়িয়াছিল তেমনি এখন সংস্কৃতের উপর দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সময় হইতেই, গীতগোবিন্দ ভিন্ন অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ও তাহার অনিবার্য্য প্রভাবে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইতেছিল। নবোদিত ও জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তৃত দেশীয় ভাব ও ভাষার আদর্শকে আত্মসাৎ করিয়া, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত ও নূতনরূপে গঠিত করিবার প্রয়াস সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছিল। আমাদের মনে হয়, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এই নূতন প্রয়াসের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেশী গানের আদর্শে রচিত হইলেও পদাবলীগুলিকে ঠিক দেশীয় গান বলা যায় না। দেশীয় ভাষার পদ্ধতি ও ভঙ্গি, দেশীয় গীতাভিনয়ের সঙ্গীত বাহুল্য ও ভাবপ্রবণতা ক্রমশঃ সংস্কৃতে রচিত কাব্যে-নাটকে আসিয়া পড়িতেছিল; গীতগোবিন্দে তাহাই দেখা যায়। কিন্তু ইহার অলঙ্কারবহুল ও পরিণত রচনাকৌশল সংস্কৃতের অনুগামী, প্রাকৃতের নয়। যে যমক-অনুপ্রাসাদির নিপুণ প্রয়োগ ইহার সংস্কৃত শব্দ ও অর্থবিন্যাসে পাওয়া যায় তাহা ব্যঞ্জনবর্ণবিরল প্রাকৃত বা অপভ্রংশ রচনায় সেই পরিমাণে সম্ভবপর নয়। সুতরাং কাব্যটি যদি প্রথমে প্রাকৃত বা অপভ্রংশে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধরিতে হইবে এই শব্দালঙ্কারগুলির প্রাচুর্য্য প্রথম রচনায় ছিল না; পরে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইবার সময় ইহাদের সন্নিবেশ হইয়াছে। কিন্তু গীতগোবিন্দ যে এরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রচনা তাহা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার শব্দবর্ণের বিন্যাস-কৌশল ও অলঙ্কার-সন্নিবেশ বাহির হইতে আরোপিত ব্যাপার নয়, ইহার রচনা-পদ্ধতির স্বাভাবিক অঙ্গ। কাব্য হিসাবে ইহার ভাব ও ভাষার যে অচ্ছেদ্য ঐক্য ও সমগ্রতা রহিয়াছে, তাহা ভাষান্তরিতমাত্র রচনায় সম্ভবপর বলিয়া কোনও কাব্যরসিক স্বীকার করিবেন না। এখানে দেশীয় গানের প্রভাব অঙ্গীকার করিয়া সংস্কৃত রচনা-নৈপুণ্য দেশীয় ধরনের গান বা পদাবলী রচনা করিয়াছে; দেশীয় গানকে কেবল সংস্কৃতে অক্ষরানুযায়ী অনুবাদ করে নাই। যেরূপ পরিবর্ত্তন-যুগের কথা আমরা উপরে বলিয়াছি, সেরূপ যুগেই এই শ্রেণীর অনিয়ত রচনার সম্ভব হইয়াছিল—যে রচনা পূর্ণমাত্রায় সংস্কৃত নয়, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় দেশীয়ও নয়। ভাষান্তরের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয় না।

ইহার সমর্থনে বলা যায়, তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে গীতগোবিন্দ এই শ্রেণীর এক মাত্র রচনা নয়। গুজরাতের কবি রামকৃষ্ণ রচিত গোপালকালি-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থেও

গীতগোবিন্দের অনুরূপ পদাবলী দৃষ্ট হয়। এই রচনাটি নামে নাটক হইলেও, সংস্কৃত নাটকের লক্ষণাক্রান্ত নয়, বরং নূতন দেশীয় যাত্রার প্রভাবে ইহাতে নাট্যকলা ও প্রকৃত নাট্যবস্তুর অভাব, গানের আধিক্য ও ভাবপ্রবণতার প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত দেখা যায়। বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী মৈথিল কবি উমাপতি শর্ম্মার পারিজাত-হরণ নাটকে মৈথিল ভাষায় রচিত পদাবলীর সমাবেশ রহিয়াছে, এবং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই মৈথিল গানগুলি সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করা হয় নাই। নেপালে আবিষ্কৃত হরিশচন্দ্রনৃত্যও এই ধরনের মিশ্র রচনা। 'পদাবলী' শব্দটির যে নূতন অর্থ তাহাও দেশীয় সাহিত্যের নূতন প্রেরণা হইতে আসিয়াছে। কিন্তু গীতগোবিন্দের পদাবলী যদি প্রথমে দেশীয় ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে, তবে পারিজাত-হরণের পদাবলীর মত সেগুলির সেই আদিম আকা-রেই থাকিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল ; সংস্কৃতে রূপান্তরিত হইবার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ পাওয়া যায় না। পদাবলীর দেশীয়-ছন্দ-অনুযায়ী ছন্দোবৈচিত্র্য ও পাদান্ত মিলও উল্লিখিত সাময়িক পরিবেষ্টনের প্রভাবে দেশীয় গান হইতে সংস্কৃত গানে অবলম্বিত হইয়াছিল ; ইহা দেশীয় গানের সংস্কৃত অনুবাদের নিদর্শন নয়।

বাংলা দেশের বাহিরেও গীতগোবিন্দের সমাদর ও প্রভাব যে কত বিস্তৃত ও গভীর ছিল, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে ইহার বার-তেরটি অনুকরণ ও প্রায় চল্লিশটি বিভিন্ন প্রদেশে রচিত টীকাগ্রন্থ ; সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ মিথিলা ও উড়িষ্যা জয়দেবকে তাহাদের দেশজাত কবি বলিয়া দাবী করিবে। এই দুই প্রদেশে জয়দেবের প্রভাব যে যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। গীতগো-বিন্দের একজন সুপরিচিত টীকাকার হইতেছেন মৈথিল শঙ্কর মিশ্র। মিথিলার কবি ভানুদত্ত রাধাকৃষ্ণের নয়, হরগৌরীর বিলাসবর্ণনাত্মক গীতগৌরীশ কাব্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দের কিরূপ সাক্ষাৎ অনুকরণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। যথা জয়দেব পদাবলীতে রহিয়াছে—

নিভৃত-নিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্।
চকিত-বিলোকিত-সকল-দিশা রতি-রভস-রসেন হসন্তম্।
সখি হে কেশিমথনমুদারং
রময়া ময়া সহ মদন-মনোরথ-ভাবিতয়া সবিকারম্।।

ইহার অনুকরণে ভানুদত্ত লিখিতেছেন—

অভিনব-যৌবন-ভূষিতয়া দর-তরলিত-লোচন-তারম্।
কিঞ্চিদুদঞ্চিত-বিহসিতয়া চলদবিরল-পুলক-বিকারম্।
সখি হে শঙ্করমুদিতবিলাসং
সহ সঙ্গময় ময়া নতয়া রতি-কৌতুক-দর্শিত-হাসম্।।

পুনশ্চ, জয়দেব—

প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদম্।
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত-মীনশরীর, জয় জগদীশ হরে।।

ভানুদত্ত—

ভ্রমসি জগতি সকলে প্রতিলবমবিশেষম্।
শময়িতুমিব জনখেদমশেষম্।
পুরহর কৃত-মারুতবেষ, জয় ভুবনাধিপতে।

এইরূপ ভানুদত্তের সমগ্র কাব্য হইতে দেখান যায়। উড়িষ্যার গজপতি প্রতাপরুদ্রের সমকালবর্তী রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক ঠিক এই ধরনের রচনা নয়; কিন্তু ইহাতে জয়দেবের অনুকরণে কয়েকটি পদাবলী রহিয়াছে। যথা—

মৃদুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্লব-বল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্।
তিলক-বিড়ম্বিত-মরকত-মণিতল-বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্।
যুবতি-মনোহর-বেষং
কলয় কলানিধিমিব ধরণীমনু পরিণত-রূপবিশেষম্॥ ইত্যাদি

এই ধরণের পদাবলী যে কিরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল তাহা সংস্কৃতে রচিত পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে বুঝা যায়। প্রবোধানন্দের সঙ্গীতমাধবে, কবিকর্ণপুরের আনন্দ বৃন্দাবন-চম্পূতে, রূপ গোস্বামীর গীতাবলীতে এবং জীব গোস্বামীর গোপালচম্পূতে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে। ইহার ভাষা, ভঙ্গি ও ছন্দ কিরূপ অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা রূপ গোস্বামীর একটি পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলে বুঝা যাইবে—

কোমল-শশিকর-রম্য-বনান্তর-নির্মিত-গীত-বিলাস।
তূর্ণসমাগত-বল্লবযৌবত-বীক্ষণ-কৃতপরিহাস॥

জয় জয়

ভানুসুতা-তট-রঙ্গ-মহানট সুন্দর নন্দকুমার।
শরদঙ্গীকৃত-দিব্যরসাবৃত-মঙ্গল-রাসবিহার॥ (ধ্রুব)
গোপীচুম্বিত-রাগকরম্বিত-গান-বিলোকন-লীন।
গুণগর্বোন্নত-রাধাসংগত-সৌহৃদ-সম্পদধীন॥
তদ্বচনামৃত-পান-মদাহৃত-বলয়ীকৃত-পরিবার।
সুরতরণীগণ-মতি-বিক্ষোভন খেলন-বল্গিত-হার॥
অম্বুবিঘাতন-নন্দিত-নিজ্জন মণ্ডিত-যমুনাতীর।
সুখসংবিদ্‌ঘন-পূর্ণসনাতন-নির্মলনীল-শরীর॥

এমন কি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মত অবৈষ্ণব গ্রন্থেও যে গীতগোবিন্দের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল তাহা উক্ত গ্রন্থের দুএকটি পদাংশ হইতে বুঝা যায়: যথা—

রসিকেশ কেশব হে।
রসসরসীমিব মামুপযোজয় রসময় রসনিবহে॥*

* [সুশীলকুমার দে: 'নানা নিবন্ধ' (মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১৯৫৪) থেকে পুনর্মুদ্রিত।]